

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্য ও পুরুলিয়ার ছো

চণ্ডীচরণ মুড়া

সংক্ষেপিত : মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিলগ্নেই জীবনছন্দের সঙ্গে তাল রেখে একান্ত বাস্তব প্রয়োজনেই নৃত্যকলার সূচনা ঘটে। জীবনের জন্য শিকারের প্রস্তুতি, পশু ও বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীর সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই এবং অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে যুথবদ্ধ চেতনার জন্ম ও ক্রমশ সচেতন প্রয়াসে আদিম মানব আরণ্যক পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৃত্যের উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে যে জীবনছন্দ ছিল অস্তিত্বের সংগ্রামের আবশ্যিক দেহভঙ্গি, তাই পরিবর্তিত নূতন আর্থসামাজিক পরিবেশে সরলভঙ্গিতে সৃষ্টি করল লোকনৃত্য। অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবাহে সংহত লোকসমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে, সমষ্টিগত সচেতন প্রচেষ্টায়, সহজাত প্রবৃত্তিজাত আকাঙ্ক্ষার আবেগে প্রয়োগ-নির্ভর, শৈল্পিক দেহভঙ্গির ঐতিহ্যবাহী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতীক প্রকাশক নৃত্যই লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যে যতই সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মননের প্রলেপ পড়েছে ততই তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সূক্ষ্ম শিল্পরূপের ছাপ। আমার আলোচনার বিষয় পরিশীলিত নৃত্য নয়, লোকনৃত্য, যে নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার আছে এবং তা সীমাবদ্ধ থাকবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্য ও পুরুলিয়ার ‘ছো’ এর মধ্যে।

প্রধান শব্দ : সংস্কৃতি, শিল্পরূপ, মুখোশ, আদিবাসী, ছদ্মবেশ, জাদুভঙ্গিমা, পুষ্টপোষকতা

বিনোদনের যতগুলো মাধ্যম আছে নৃত্য তার মধ্যে অন্যতম। আনন্দে আমরা গান গেয়ে উঠি যেমন গানের গলা না থাকা সত্ত্বেও, সুর নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও; তেমনি আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশে আমরা নেচে উঠি তা সে নৃত্যের ব্যাকরণ জানা না থাকলেও। তাই বলে নৃত্যকে নিছক আনন্দ প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে দেখলেই দেখা সম্পূর্ণ হয় না। তার অন্য দিকও আছে। সে দিক তার আচরণগত, ইংরেজিতে যাকে বলে Ritualistic। এখন প্রশ্ন জাগে এই নৃত্য কীভাবে মানুষের জীবনপ্রবাহে এসে মিশেছিল? নিছকই কী বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে, না অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল? বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যে নৃত্য আমরা দেখছি তা হঠাৎ করে আমাদের জীবনে আসেনি। সভ্যতার অনেক সিঁড়ি পেরিয়ে বহুগুণে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও ঘষা-মাজার পর বর্তমান চেহারা লাভ করেছে। এই পরিশীলন ও রূপান্তর সকল নৃত্যে ঘটেনি। যার মধ্যে এই রূপান্তর এসেছে সেই নৃত্য আদিবাসী নৃত্যের খোলস ত্যাগ করে লোকনৃত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আরও পরে Classical নৃত্যের কোঠায় পৌঁছেছে।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিলগ্নেই জীবনছন্দের সঙ্গে তাল রেখে একান্ত বাস্তব প্রয়োজনেই নৃত্যকলার সূচনা ঘটে। জীবনের জন্য শিকারের প্রস্তুতি, পশু ও বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীর সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই এবং অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে যুথবদ্ধ চেতনার জন্ম ও ক্রমশ সচেতন প্রয়াসে আদিম মানব আরণ্যক পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৃত্যের উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে যে জীবনছন্দ ছিল অস্তিত্বের সংগ্রামের আবশ্যিক দেহভঙ্গি, তাই পরিবর্তিত নূতন আর্থসামাজিক পরিবেশে সরলভঙ্গি তে সৃষ্টি করল লোকনৃত্য। অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবাহে সংহত লোকসমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে, সমষ্টিগত সচেতন প্রচেষ্টায়, সহজাত প্রবৃত্তিজাত আকাঙ্ক্ষার আবেগে প্রয়োগ-নির্ভর, শৈল্পিক দেহভঙ্গির ঐতিহ্যবাহী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতীক প্রকাশক নৃত্যই লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যে যতই সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মননের প্রলেপ পড়েছে ততই তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সূক্ষ্ম শিল্পরূচির ছাপ। আমার আলোচনার বিষয় পরিশীলিত নৃত্য নয়, লোকনৃত্য, যে নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার আছে এবং তা সীমাবদ্ধ থাকবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্য ও পুরুলিয়ার ‘ছো’ এর মধ্যে।

আলোচনার মূলপর্বে ঢোকান আগে জেনে নেওয়া দরকার মানুষের জীবনে কেন মুখোশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং তা নৃত্যে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বা কী ছিল। এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন যে নৃত্যের ছবি পাওয়া গেছে, তার বয়স কমবেশি কুড়িহাজার বছর। দক্ষিণ ফ্রান্সের আরীজ অঞ্চলের বিভিন্ন পাহাড়ে বেশকিছু প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র খুঁজে পাওয়া গেছে, যার মধ্যে একটি হল ‘ত্রোয়া ফেরা’ বা তিনভাই (তিনটি ভাই খেলা করতে করতে ঐ গুহাটি খুঁজে পেয়েছিলেন বলে সম্ভবত এই নামকরণ)। গুহার প্রবেশ পথের মুখে নানারকম প্রাণীর ছাল-চামড়া-শিং ইত্যাদিতে সেজেগুজে একজন নৃত্যরত মানুষের ছবি আঁকা রয়েছে। এইটিই প্রাপ্ত প্রাচীনতম ছবি, যাতে নৃত্যের ভঙ্গিতে কোনও মানুষকে দেখা যাচ্ছে। ঐ গুহাচিত্রে অঙ্কিত মানবটির মাথায় বাল্লা হরিণের শিং দেখেই এই সময়টা চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে; কারণ শেষ তুয়ার যুগের সমাপ্তি ঘটেছে হাজার বিশেক বছর আগে, তার মধ্যে ইউরোপে বাল্লা হরিণদের আর দেখা মেলেনি। এই ধরনের ছবিকে অ্যাবে অঁরি ব্রুইল (Abbe Henri Breuil) তাঁর ‘ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরিজ অব কেভ আর্ট’ (Four Hundred Centuries of Cave-Art, 1952) বইতে আদিম মানুষের জাদুনৃত্যের নমুনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যেই মুখোশের উদ্ভবের মূল সূত্রটি নিহিত আছে।

ভারতে নাচের প্রাচীনতম যে প্রত্ননিদর্শ মেলেনি, তা হল মধ্যপ্রদেশের ভূপাল-অঞ্চলের ভীমবেটকা পাহাড়ের একটি গুহাচিত্র। গাছের ডালপালা আর হরিণের শিঙে সজ্জিত একটি মানুষ ত্রিশূল জাতীয় অস্ত্র নিয়ে নাচছে। এই ছবির বয়স কমবেশি আট হাজার বছর।

সবচেয়ে পুরনো মুখোশের বয়স তাহলে পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী কুড়ি হাজার বছরের বেশি ধরতে হয় এবং আট হাজার বছরের মুখোশ পরা মানুষের গুহাচিত্রের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এখন প্রশ্ন হল সেই সুদূর অতীতে মুখোশ কী কারণে মানুষ তৈরি করল? জীবন-সংগ্রামের কোন বিশেষ তাগিদে?

ব্রাইলের (A. H. Breuil) যুক্তিকে এক্ষেত্রে মানতেই হয়। তিনি বলেছেন এটি হল জাদুকরের ছবি। তবে আদিম প্রস্তরযুগে সমাজে জাদুকরের ভূমিকা কী ছিল তাও জানা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা হল যে কোনও অনুন্নত এবং নিজেদের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ-সমাজে জাদুবিশ্বাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাদুকরকে সে যুগের মানুষ ধর্মগুরু হিসাবে স্বীকার করতেন এবং সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে মেনে নিতেন। মানব কল্পিত সমস্ত প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তির সংযোগ মাধ্যম এই জাদুকর। সুতরাং সেই হল দলের সমস্ত লোকের শুভাশুভ বিচারক, চিকিৎসক, রীতিনীতিবিধানের নিয়ন্তা এবং উচিত-অনুচিতের হিসেবে করণীয়-অকরণীয় সবকিছুতে তার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ অন্নসন্ধান, রোগনিরাময়, ভয়মুক্তি, কামতৃপ্তি থেকে শুরু করে পারলৌকিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান পর্যন্ত সর্ববিধ প্রয়োজনের পরিত্রাতা হলো এই জাদুকরই। আর সেই জাদুকরের কর্মবিধির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য উপকরণ হলো মুখোশ।

জীবনের এই সমস্ত প্রয়োজনগুলো আদিম মানুষ মেটাতে জাদুবিশ্বাস কেন্দ্রিক ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে। মুখোশ-নৃত্য ছিল ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা বহুশতাব্দীর পথ পরিভ্রমার পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নানা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও অল্পবিস্তর বেঁচে আছে। এমন কি সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় যে সমস্ত সমাজ উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে গিয়ে উদ্ভীর্ণ হয়েছে কোনও না কোনও সময়ে, তাদের মধ্যেও যে মুখোশের ব্যবহারের রীতি মুছে গেছে এমন নয়। প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের প্রসঙ্গ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ভারত এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনও কোনও দেশ, যেমন তাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়া আজও মুখোশ-নৃত্যের ধারাকে ধরে রেখেছে ধ্রুপদী এবং লৌকিক উভয় পর্যায়েই। জাপান এবং ভারতের মুখোশ নৃত্যের কথা তো অনেকেরই জানা।

মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন অবশ্য খুব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে। তারপরই উল্লেখযোগ্য মুখোশ ব্যবহারকারী হলেন আমেরিকা মহাদেশের আদি বাসিন্দা তথা রেড ইন্ডিয়ানদের অসংখ্য প্রজাতির মানুষজন, যারা পুরোপুরি ‘মার্কিনি’ হতে পারেননি এখনও। আমাদের ভারতীয় এমনকি বাঙালি-সংস্কৃতির লোকায়ত স্তরেও বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীনৃত্যে মুখোশের যথেষ্টই প্রচলন লক্ষিত হয়।

মুখোশ শিল্পের প্রত্ন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে মুখোশ তথা ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ ছিল বিভিন্ন প্রাণীর মাথা, ছাল, শিং, লেজ ইত্যাদি। বিশেষ কোনও ছদ্মবেশ ধরে (কখনও কখনও কণ্ঠস্বর নকল করে) যে প্রাণীদেরকে আকর্ষণ করে কাছে নিয়ে এসে শিকার করার সুবিধা হত, আদিম মানুষও এটা বুঝতে পেরেছিলেন। এখনও দেখা যায় সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বানরের কণ্ঠস্বর নকল করে হরিণকে কাছে এনে শিকার করে। বানর হল হরিণের বন্ধু। গাছ থেকে ডালপালা ভেঙে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে এক প্রকার সুরে ডাকে, আবার সামনাসামনি বাঘ পড়লে পালিয়ে

যাওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আর এক সুরে ডাকে। সুন্দরবনের ‘কুয়েল’ বৃত্তিধারী মানুষ প্রথম সুরটিকে নকল করেই হরিণ শিকার করে। ভগীরথ মিশ্রের ‘কুয়েল’ গল্পটিতে কৈলাস সর্দার এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। পুরুলিয়ার পাহাড় সংলগ্ন মানুষ এক ধরনের পাখির সুর নকল করে বাঁশির সাহায্যে এবং যথারীতি পাখিটি ফাঁদে পা ফেলে। এই ধরনের শিকারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজেই। ফলে মুখোশ ব্যবহারের পক্ষে প্রত্নশিল্পের পণ্ডিতগণ যেসব যুক্তি খাড়া করেছেন তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই যে মুখোশ হিসেবে কিছু একটা বস্তুকে ধরে নেওয়া অথবা গড়ে তোলা — এর সঙ্গে আদিম সমাজ-মানসের বর্হিকাঠামোতে উদ্ভূত ধর্মের অনুভূতিও মিশ্রিত হত খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনগুলি থেকে সঞ্জাত বোধের অন্তর্কাঠামোর সঙ্গে।

নৃত্যের উদ্ভব যেহেতু জাদুর সূত্রেই হয়েছিল; সেহেতু মুখোশ, ছদ্মবেশ, জাদুভঙ্গিমা প্রভৃতি ছিল তার প্রাথমিক উপকরণ। আবার যেহেতু পশুশিকারই ছিল সেই সময় মুখ্য জীবিকাশ্বেষণ; তাই শুধু পশুর ছদ্মবেশ ধরাই নয়, তাদের চলাফেরা, হাবভাব, লাফঝাঁপ, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতিও তখন ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতে হত মানুষকে। তাই নাচের মধ্যে পশুসুলভ চলন এখনও অনুসৃত হয়। পুরুলিয়ার ছো-এর একটি বিশিষ্ট চলনভঙ্গির নামই ‘পশুচাল’। ঠিক একইভাবে ‘দেবচাল’ এবং ‘দানব চাল’ নামে আরও দুটি চলনভঙ্গি বজায় আছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ দুটি চলন ভঙ্গিমাও আদিম নৃত্যকলার অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস বোধেরই সন্ধান দেয়।

আদিম নৃত্যকলা আদিবাসী সংস্কৃতির নৃত্যের মধ্যে কেমন করে বিবর্তিত হয় এবং লোকনৃত্যে কীভাবে তার উদ্ভর্তন ঘটে, গবেষক হিসেবে সেই বিষয়টা অনুধাবন করতে গেলে সবচেয়ে সহজগম্য অথচ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নৃত্যছাঁদ হিসেবে পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যকেই বোধ হয় গণ্য করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের অভিমতটি গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে “১৯৭৮ সালের এপ্রিলে পুরুলিয়া শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে কাঁটাডি গ্রামে আকাদেমি অব ফোকলোর-এর উদ্যোগে আয়োজিত ছো-নৃত্য উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় বিশিষ্ট ছো-শিল্পী গম্ভীর সিংমুড়া এবং নেপাল মাহাতো এই নাচের আদিরূপ হিসেবে ‘কাঁপঝাঁপ’ নামে একটি প্রকরণের কথা বলেছিলেন; কিন্তু তখন উপস্থিত কোনও বিশেষজ্ঞ শিল্পীই সেটা কী রকম যে ছিল তার ব্যাখ্যা দেননি। ওঁরা একবাক্যে বলেন, শুধু ঐ নামটুকুই ওঁদের শোনা।”

ছো-নৃত্যের প্রাচীন রূপ হিসাবে ‘কাঁপঝাঁপ’-কে যেহেতু ধরা হয়, সে কারণে তার সম্পর্কে কিছু বলা এখানে প্রয়োজন। সেই কাঁপঝাঁপের মোটামুটি একটা আঙ্গিকের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। পুরুলিয়ার ছো-এর যাঁরা গুরু, তাঁদের গুরু বলে স্বীকৃত হতেন মধু রায়, মধু রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হীরালাল রায় পিতার কাছ থেকে শেখা অনেক বিস্মৃতপ্রায় নৃত্য কৌশলকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সচেষ্ট হন। ‘কাঁপঝাঁপ’-এর স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আকাদেমির

ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকগণ তাই হীরালালবাবুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এবং সকলের অনুরোধে হীরালালবাবু তাঁর ছাত্র ও সহশিল্পীদের নিয়ে ‘কাঁপ-ঝাঁপ’ নাচের অনুষ্ঠান দেখান। এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সেনগুপ্তের ক্ষেত্রসমীক্ষার বিবরণটি প্রাধান্যযোগ্য — “মাঠের মাঝখানে টুসু-চৌদলের আদলে একটি কাঠামোকে ফুলপাতা দিয়ে সাজিয়ে তার সামনে ফুল-ফল-মিষ্টি ইত্যাদি রাখলেন একজন ‘পুরোহিত’। জানা গেল তিনি ব্রাহ্মণ নন, মাহাতো। ঐর পিঠের দিকে একটা শারীরিক অসঙ্গতি দেখা গেল, এবং হীরালালবাবুর জনৈক সহযোগী জানালেন যে শারীরিকভাবে কিছু না কিছু অসঙ্গতি/বিকৃতি সম্পন্ন মানুষেরাই নাকি আগের আমলে কাপ-ঝাঁপের উপলক্ষ্যে পূজার পুরোহিত হতে দায়িত্ব পেতেন, এই রকমই তারা জানেন। কারণ অবশ্য তিনি বলতে পারলেন না। (তবে ‘ফিজিক্যাল-ডিফর্মিটি’-থাকা মানুষেরা নাকি কিছুটা অসাধারণ/অ-লৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন, এমন একটা আদিম বিশ্বাস পৃথিবীর বহু সংস্কৃতিতেই প্রাপ্য; “কানা-খোঁড়া, একগুণ বাড়া”- ইত্যাদি প্রবাদে ওই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে।) এরপরে, একদল ‘শিল্পী’ (অথবা, ‘পূজারী’) ছৌ-এর পালায় ব্যবহার্য পশুর-নকল-লেজে সজ্জিত হয়ে পরের পর উবু হয়ে বসে পড়লেন পুরোহিতের পিছনে, খানিকটা দূরত্ব রেখে। এরপর প্রথমজন বাদে অন্যরা সামনের শিল্পীর কোমর দু’হাতে ধরে হামা-দেওয়ার ভঙ্গিতে বসলে — প্রথমজন ছৌ-এর ‘ছপ্কা-দেওয়া’-র (দুই হাঁটু দু-দিকে বেঁকিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঘুরে যাওয়া; এই চালকে ‘উল্ফা/উফ্লা’-ও বলা হয় অনেক সময়ে) ভঙ্গিতে লাফিয়ে পুরোহিত-এবং-চৌদলকে টপকে ওপারে গিয়ে কিছুটা দৌড়ানোর পরে, ফের চৌদলের দিকেই মুখ করে বসলেন। ঠিক একই কাজ প্রতিটি শিল্পীই করলেন আগের মতো ভঙ্গিতেই। এরপরে আবারো লাফানোর পালা। এইভাবে দশ-বারো-বার নাচা-এবং-বসে-পড়ার পরে সমস্ত অংশগ্রহণকারী শিল্পী-এবং-দর্শককে ফল-মিষ্টির টুকরো প্রসাদ হিসেবে দিলেন সেই পুরোহিত এবং তারপরে প্রচলিত ছৌ-নাচের মহলা দেবার মতো করে প্রায় একঘণ্টা নাচলেন শিল্পীরা। সব শেষে ফের একবার পরের পর সবাই চৌদল টপকে গেলেন ‘ছপ্কা’ দিয়ে। তখন আর পুরোহিত সেখানে বসে থাকেননি।”

এই নৃত্য দেবতার সন্তুষ্টির জন্য করা হত বলে মত প্রকাশ করেন হীরালালবাবু। পরবর্তীকালে গণেশ, দুর্গা, শিব-প্রমুখ দেবতাদের সাজে এবং আরও পরবর্তীতে দেবতাদের মুখোশ পরে পালা-নাচ করার রীতি প্রচলিত হলে ক্রমশ চৌদল সাজিয়ে পূজা এবং আনুষঙ্গিক ‘কাঁপ-ঝাঁপ’ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। হিন্দু পুরাণের কাহিনীকেন্দ্রিক পালার অনুপ্রবেশ ঘটায় ‘কাপ-ঝাঁপ’ তার আদিম পূজা-আচারকৃত্যের নির্মৌক ত্যাগ করে ‘ছৌ’ নামক নৃত্য প্রকরণের জন্ম দেয়।

‘কাঁপঝাঁপ’-এ ধর্মের ব্যাপার কতখানি ছিল, কীভাবে ছিল, তা বলা ভারি শক্ত। তবে অধ্যাপক সেনগুপ্তের ক্ষেত্র সমীক্ষণের বিবরণটি থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, ধর্মপ্রত্যয়ের ইঙ্গিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি জুড়ে থাকলেও তা অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির। বরং ধর্মের চেয়ে অলঙ্কিত কিছু জাদুত্রিয়ার ভাবনায় প্রচ্ছন্ন রূপে

আছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় বর্ণনাটিতে কোথাও প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের প্রসঙ্গ নেই। মনে হয় মেয়েদের আসরে ঢোকাটা একটা ট্যাবু। এই ট্যাবুই হল জাদু প্রক্রিয়ার সূচক। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল ‘কাঁপঝাঁপ- এ নকল লেজ লাগিয়ে পরস্পরের কোমর ধরে যে লাফ-ঝাঁপ এর প্রসঙ্গ আছে, ঠিক সেইভাবে কোমরে লাঙ্গুল বেঁধে একে-অপরের কোমর ধরে হামাগুড়িরত অবস্থায় নাচের একটা ছবি সি. এম. বাওয়ার (C. M. Bowra) ‘প্রিমিটিভ সং’ (Primitive Song, New York 1962) বইয়ের ২১ নং চিত্রে দেখা যায়। এই নাচটি মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ইলহাল রনট্জা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। আঠারো শতকের একজন ভ্রমণকারীর আঁকা এই ছবিটিকে বাওরা প্রামাণ্য হিসেবেই ধরেছেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে ‘কাঁপঝাঁপ’-এর রূপান্তরিত নৃত্য প্রকরণ ‘ছো’। ‘কাঁপ-ঝাঁপ-এর আদিম পূজা পদ্ধতি লাফ-ঝাঁপের উর্দ্ধে উঠতে পেরেছে বলেই ‘ছো’ আজ বিশ্ববন্দিত। ‘ছো’ এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যায় তার বৈচিত্র্যময় মুখোশের ব্যবহার। এখন প্রশ্ন জাগে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও বেশ কিছু মুখোশ নৃত্য আছে, সেগুলো তাহলে আঞ্চলিকতার গণ্ডি টপকাতে পারেনি কেন? উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ নৃত্যগুলো কেন ‘ছো’ এর জায়গায় পৌঁছতে পারেনি— সেই প্রশ্নে আলোচনার পূর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি মুখোশ নৃত্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

মুখা খেইল্ : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে মুখোশ পরে খেলাচ্ছিলে হয় নৃত্য কিংবা নৃত্যনাট্য। মুখোশকে প্রাপ্ত-উত্তরবঙ্গে বলা হয় ‘মুখা’। ‘মুখা’ পরে যে নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি করা হয়, তাই হল মুখা-খেইল্। ‘খেলা’ পদের অপিনিহিতি রূপ হল ‘খেইল্’। উক্ত অঞ্চলে কোনও অভিনয়-অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করাকে ‘খেলা’ বলা হয়। যেমন, ব্রতানুষ্ঠান করাকে ‘ব-খেলা’ (ব্রত খেলা), ‘ভাদৈ খেলা’ (এই নামীয় ব্রত উদ্‌যাপন করা) বলা হয়। অবশ্য ‘মুখাখেলী’, ‘মুখাখেল্’ প্রভৃতি নামও প্রচলিত আছে। ‘মুখা খেলা’ সর্বাধিক প্রচলিত।

মূলত মুখোশ পরে নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি ছিল আনুষ্ঠানিক একটি ব্যাপার। বছরের কোনও নির্দিষ্ট দিন বা সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট কোনও দেবতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই প্রকার নৃত্য-গীত-অভিনয় করা হয়। বর্তমানে তা আনুষ্ঠানিকতায় নেমে এসে প্রমোদমূলক হয়ে উঠেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের বাঁধন উঠে গিয়ে বছরের যে কোনও সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মানুষ কিংবা মানবের প্রাণীর মুখোশ পরে, চরিত্রানুযায়ী এই নৃত্য-গীত-অভিনয় করা হয়। মুখোশগুলির শিল্পগত ও নির্মাণগত দিকটি উল্লেখযোগ্য। মুখোশ মূলত হয়ে থাকে দারুনির্মিত, তবে অন্যান্য উপকরণ দিয়েও মুখোশ নির্মিত হয়ে থাকে। বাঁশের গোড়া, লাউয়ের খোল, পোড়ামাটি, কাগজের মণ্ড, পুরাতন বস্ত্র খণ্ড প্রভৃতি দিয়ে মুখোশ তৈরির প্রথা যেমন আছে, ঠিক তেমনি কুলো ও বাঁশের চোঁচাড়ি দিয়েও মুখোশ নির্মিত হয়ে থাকে। তবে মুখোশের গঠন পদ্ধতি সহজ-সরল, কারণ নিজেরাই তৈরি করে থাকে এই মুখোশ।

জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পশ্চিমাংশেই এই প্রকার অভিনয়ের প্রাদুর্ভাব-প্রচলন বেশি। সাধারণত শীতের সময় এই পালা অভিনীত হয়ে থাকলেও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে কাজের অবসরে গাঁয়ের মোড়লের বাড়ির উঠোনেই জমে ওঠে পালা। বিশ-পঁচিশজন একসঙ্গে জুটলেই আলোচনার মাধ্যমে পালা ঠিক হয়। পূর্ব মহড়া বা প্রস্তুতি ছাড়াই তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে মুখোশ এনে শুরু হয়ে যায় পালা অভিনয়। সামাজিক ও পৌরাণিক উভয় প্রকার বিষয় স্থান পেলেও সমাজ বিষয়ক কাহিনীগুলিই বেশি চমকপ্রদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই পালা দু’-পাঁচ মিনিটের বেশি সময় চলে না। ফলে কাহিনীর মধ্যে তেমন কোনও অগ্রগতি বা নাট্যের ইঙ্গিত থাকে না বললেই চলে। কেবলই বিবৃতি, কেবলই কোনও বিশেষ একটি ‘চিত্র’ উপস্থাপন। পালায় কোনও লিখিত রূপ কখনই থাকে না। গান, সংলাপ, নৃত্য সবই অল্পবিস্তর মিলেমিশে থাকে। ইদানীং নৃত্যাংশ বড় কমে এসেছে। রূপসজ্জা তেমন কিছু থাকে না, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও স্বাভাবিক পোশাকের ওপরেই মুখোশ ধারণ করা হয়। উন্মুক্ত আকাশ তলে খোলা প্রান্তরেই অভিনয় হয়ে থাকে। নারীর ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করে। এক একটি গ্রামে একাধিক মুখাপালার দল থাকে।

সিঙ্গীছম : দার্জিলিং জেলার তিব্বতীয়দের মধ্যে প্রচলিত একটি অন্যতম নৃত্য হল ‘সিঙ্গীছম’। এই নৃত্যের বিশিষ্টতা দারুণ নির্মিত মুখোশের ব্যবহার। বিশেষ তিথিতে এই নৃত্যোৎসব হয়ে থাকে। এই নৃত্যের প্রচলন ও ব্যাপ্তিস্থল মূলত কার্শিয়াং, কালিম্পং ও সদর শহর দার্জিলিং এর মধ্যে।

মুখোশপরা নৃত্যাদির মধ্যে সিঙ্গীছমের প্রসিদ্ধি বেশ ভালোই। এই নৃত্য দ্বৈতনৃত্য, দু’জন মানুষ যৌথ ভাবে একটি সিংহের বেশ ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে পা ফেলে নৃত্য করে। সিংহের মুখোশ দুই হাতে ধরে সম্মুখে দাঁড়ায় একজন, পশ্চাদে যিনি থাকেন উবু হয়ে তিনি সামনের জনের স্কন্ধে রাখেন তার ডান হাত। পিছনের ব্যক্তির শরীরে থাকে সিংহ চর্মের বা সেই জাতীয় কৃত্রিম কিছু দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন। এর ফলে দেখতে অনেকটা সিংহের মতই লাগে। পুরুলিয়া ছো-নৃত্যে সজ্জিত বাঘ, ভালুক, কুমীর প্রভৃতি পশুদের আদলেই অনেকটা তৈরি সিঙ্গীছমের ‘সিঙ্গী’।

এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য উভয় শিল্পীকে একসঙ্গে পদচালনা করতে হয়। একজন অসতর্ক হলেই নৃত্যের ছন্দ বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার ফলে তারা উৎপ্লাবন পর্যন্ত করে নৃত্য করতে সমর্থ। প্রথমেই ভাঁড়ের মধ্যে প্রবেশ ও নৃত্য প্রদর্শন। সম্ভবত দর্শকদের আনন্দদানের মধ্যে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই ভাঁড় চরিত্রের অবতারণা। তারপর প্রবেশ ঘটে সিংহের। নৃত্য করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ও পাদকর্মে।

চমরীছম বা ইয়াছম : চমরী গাইকে তিব্বতে বলে ‘ইয়াক’, চমরী গাই-এর বেশ ধরে যে নৃত্য তাকে বলে ‘ইয়াছম’। নেপালি ভাষায় একই নাচকে বলে ‘চমরীছম’। রাষ্ট্রের সীমারেখা সবসময় নির্দিষ্ট আবহাওয়া ও জলবায়ুকেন্দ্রিক হয় না। তাই প্রায় একই জলবায়ু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে যেমন, ঠিক তেমনি পাশাপাশি অবস্থান থাকায় প্রতিবেশি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নেপাল ও

ভুটানের জলবায়ু অভিন্ন। একই জল-হাওয়া সেই অঞ্চলের সংস্কৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে যে চমরী গাই নেপাল-ভুটানে লালিত হয়, সেই চমরী গাই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য প্রান্তেও পালিত হয়। তাই চমরী গাইকে কেন্দ্র করে যে নৃত্য-সংস্কৃতি নেপাল ভুটান তিব্বতে অনুষ্ঠিত হয়, পাশাপাশি থাকার দরুণ দার্জিলিং-কার্শিয়াং-কালিম্পং অঞ্চলেও লক্ষিত হয়। সংস্কৃতির মিলন এভাবেই দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে যায়।

‘সিঙ্গীছম’ের অনুরূপ নৃত্য ‘চমরীছম’। মুখে চমরীর মুখোশ, সর্বান্তে চমরীর লোমশ আচ্ছাদনে ঢেকে দ্বৈত শিল্পীর সমন্বয়ে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই তিব্বতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে প্রবেশ ঘটে চমরী পালকের। এক হাতে তার পাচনি এবং কটিতে থাকে বাঁশি। চমরী পালকের বাঁশি বাজানো শুরু হয়, অনেকটা ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের অনুরূপ ভঙ্গিমায়। বাঁশির সুমধুর সুর ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। সুরের আকর্ষণে প্রবেশ ঘটে চমরী গাইয়ের অনুরূপ অঙ্গসজ্জায় ভূষিত চমরীর। বাঁশির সুরে সর্পের মোহাচ্ছন্নতার কথা আমরা জানি, এই নৃত্য-দৃশ্যে চমরী গাই-এর মোহাবিষ্টতার ছবিও পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।

পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে কোথাও বৃষ্টিপাত বেশি, আবার কোথাও হয়না বললেও চলে। বৃষ্টিপাত বেশি হলেও আবার ঢালু হওয়ার কারণে সে জল ধরে রাখাও সম্ভব হয় না, তাই কৃষিজ সম্পদ তেমন ভাবে তাদের জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে সেইসব অঞ্চলে চমরী গাই তাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। দুগ্ধ ও লোমশ চর্মই মূলত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রা। তাই সমতল ভূমিতে কৃষিজ ফসল যেমন লক্ষ্মীরূপে পূজিত হয়, তেমনি উত্তর অঞ্চলে লক্ষ্মীরূপে পূজিত হয় চমরী গাই। তবে অন্য একটি জাদুক্রিয়াও এখানে ক্রিয়াশীল। চমরীর প্রতি ভক্তি দেখে ভগবান বৃষ্টি দেন, ভূমি উর্বর হয়, ফসল ভালো হয়। Fertility cult-এর এই ভাবনা থেকেই এতৎ অঞ্চলের মানুষজন চমরীছম নৃত্যোৎসব এখনও পালন করে আসছেন।

মেপাছম : ‘সিঙ্গীছম’, ‘চমরীছম’ এর ন্যায় পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলির আর একটি বিশেষ নৃত্য প্রকরণ ‘মেপাছম’। ময়ূরকে সেই অঞ্চলে বলা হয় ‘মেপা’ এবং ময়ূর বেশধারী নৃত্যও তাই ‘মেপাছম’ নামে পরিচিত। এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল — ময়ূরের অনুরূপ মুখোশ ও পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় নৃত্য শিল্পীর মঞ্চে আবির্ভাব।

নৃত্য উৎপত্তির সাথে জড়িত আছে একটি গল্প। রাজার ছিল তিন রাণী। পাটরাণী ছিলেন রূপসী। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে মেজো ও ছোট রাণী যুক্তি করে সুয়োরানীর রূপবিকৃতি ঘটালেন পানীর সাথে বিষ খাইয়ে। রাণী মনের দুঃখে জীবন কাটান। দিনের পর দিন এমনি ভাবে কাটান, হঠাৎ একদিন একটি ময়ূর রাণীর সামনে এসে ডিম প্রসব করে। সুয়োরানীর সুমতি হয়, তারপর ভক্তি সহকারে সেই ডিম খেয়ে রাণী হলেন রূপবতী এবং পুনরায় পাটরাণীর মান-মর্যাদা ফিরে পেলেন। রাণী ময়ূরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করলেন ‘মেপাছম’ নামক নৃত্যোৎসব। তারপর বহুকাল ধরে চলে আসছে ‘মেপাছম’ নৃত্য।

ডাইনি নাচ : দার্জিলিং অঞ্চলে তিব্বতীয় লামাদের গুম্ফায় বিশেষ তিথিতে ধর্মীয় আচরণের অন্যতম অঙ্গরূপে মুখোশ পরে ডাইনি-পিশাচ নৃত্যের প্রচলন আছে। কাল্পনিক দেবতা-অপদেবতা বিচিত্র পরিচ্ছদে ও মুখসজ্জায় মুখোশ পরে; নৃত্যরীতির প্রতিটি ভঙ্গি ও পাদকর্ম প্রথানুসারী। বীভৎস ও বীররসের প্রাধান্যই ফুটে উঠতে দেখা যায় এই নৃত্যভঙ্গিতে। মুখোশের গঠন ও বর্ণপ্রয়োগে প্রথাগত প্রতীকাত্মক নির্দেশ পালিত হয়ে থাকে।

রাভন নৃত্য ও রাজধারী নৃত্যনাট্য : দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি অঞ্চলে এই নৃত্য হয় মুখোশ পরে। রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধবৃত্তান্ত নাট্যাকারে রূপায়িত হয়। রাবণ, বিভীষণ, হনুমান এবং আর কয়েকটি চরিত্রে মুখোশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাকি চরিত্র মুখোশহীন অবস্থায় অভিনয় করেন। এই নৃত্যনাট্য নৃত্য ও সংলাপ-গীতের মিশ্রণে রচিত। পালাকাব্যে উপেক্ষিত রাবণ চরিত্রের মহত্ব নিয়ে রচিত পালাগানকে ‘রাজধারী’ ও বলা হয়। রামের বনবাস থেকে রাবণবধ পর্যন্ত পালা গাওয়া হয়। বিশেষ করে এই পালা অনুষ্ঠিত হয় অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে। ‘দু’-রাত ও এক দিবসব্যাপী এই পালা চলে।

বাক্পা নৃত্য : ডুয়ার্সের তামাং জনজাতির উল্লেখযোগ্য মুখোশ-নৃত্য ‘বাক্পা’। নৃত্যের বিষয় অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভশক্তি স্থাপনের প্রয়াস। এই নৃত্যশৈলীতে বলিষ্ঠ আঙ্গিকের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই নৃত্যের মুখোশ তৈরি হয় কাঠ খোদাই করে এবং পরচুলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় চমরী গরুর লেজের চুল। মুখোশধারীরা ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ পরে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে নৃত্যাভিনয় করেন, যেমন- ঢাকপো, মানিং, সিংদুং, চেকিয়ার প্রভৃতি। বাক্পার আরও নাম আছে, যথা — নাক্পা, লামা প্রভৃতি। এই নৃত্যাভিনয়ে প্রধান বাদ্যযন্ত্র করতাল, এছাড়াও ঢ্যাংরো দুং অর্থাৎ বড় আকারের শঙ্খ। যিনি করতাল বাজান তাকে বলা হয় ‘উমজে’। এই করতাল বাদক এই নৃত্যাভিনয়ের পরিচালকও বটে। তাছাড়া ‘কাং লিং’ নামে আর এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় যা মানুষের পায়ের হাড় দিয়ে তৈরি। রঞ্জিন সিন্ধের ঢোলা জামা পোশাক হিসাবে এই নৃত্যাভিনয়ে কুশীলবরা ব্যবহার করে থাকেন। তামাং পুরোহিতরা এই নৃত্যকে বলেন ‘ছ্যাম’। এই নৃত্যের চৌদ্দটি পর্যায়। এই নৃত্যের সময় বিশেষ করে রাত্রিবেলা, দিনেরবেলা সচরাচর হয় না বাক্পা নৃত্য। মাঝখানে আগুন জ্বলে সেই আগুনকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে নৃত্য। যদি সারারাত এই নৃত্যানুষ্ঠান চলে, তবে সমগ্র নৃত্যের অনুষ্ঠানকে বলা হয় ‘রাপনে’।

রাভা জনজাতির মুখোশ-নৃত্য : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতির জীবনচর্যায় নৃত্যের স্থান অতি নিবিড়। নৃত্যকে তাঁদের ভাষায় বলা হয় ‘বসিলি’। তাঁদের শ্রম-আনন্দ-বিরহ-মিলনের বিচিত্র চিত্রণ এই নৃত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। শহর থেকে দূরে নিবিড় অরণ্যানীর কোলে লালিত রাভা সম্প্রদায়ের জীবনে অন্যান্য নৃত্যের মতো মুখোশ নৃত্যের গুরুত্বও কম নয়। এরকম দু’টি উল্লেখযোগ্য মুখোশ-নৃত্য হল, যথা ‘মাকপর বসিনি ভালুক মুখোশ-নৃত্য’ ও ‘চোর খেলোয়ী’।

কার্তিক মাসে কালীপূজার ছ'-সাতদিন পূর্বে রাভাগণ মাকপর বসিনি ভালুক মুখোশ-নাচের আয়োজন করে থাকেন। ভালুকের মুখা বা মুখোশ পরে এবং কলাপাতা বা পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি ভালুকের লোম গায়ে দিয়ে হ্যাম (ঢোল), ব্রাংছি (বাঁশি) ও দব্দি (ঘটি) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বোলের তালে তালে গ্রামে গ্রামে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে মাঙন তুলে বারোয়ারী কালীপূজা করেন। এই নৃত্যে কেবল একটি মুখোশই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুজো শেষে মুখোশটি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

রাভাদের আর একটি মুখোশ-নাচ যা আলিপুরদুয়ারের দক্ষিণ যা রো বসতির কোচাদ্রাও দল করেন - তা হল 'চোর খেলেরী' নাচ। এটিও ধর্মীয় নাচ যা মাকপর বসিনির মতোই মাঙনের সঙ্গে যুক্ত। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বাৎসরিক কালীপূজা উপলক্ষ্যে এ নাচের আয়োজন করা হয়। এই নাচে দুটি মুখোশ ব্যবহার করা হয়। ভালুক মুখোশ যিনি পরেন তাঁর দেহ পাটের আঁশের তৈরি খোলসে ঢাকা থাকে; আর হাতে থাকে বাঁকানো ছড়ি। চণ্ডীর মুখোশ যিনি পরেন তাঁর পরনে থাকে ডোরা কাটা লুঙ্গি, গায়ে বুক খোলা শার্ট, ডান হাতে প্রাচীন হাড্ডা বা তরবারি ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে। নাচের সঙ্গে বাজে খাগের দীর্ঘ কালো বাঁশি, হ্যাম, দব্দি। এই নাচের তালে তালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া হয় একটি গানের কলি, তা হল —

কালই মুই, হালিমুই মা রইন্

হালিয়া হালিয়া

আশিন-কাতিকে চোর রে চোর।।

গান ও বাজনার তালে তালে নৃত্য। কখনও তড়িৎ গতিতে, কখনও গজগতিতে, আবার কখনও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

'চোর খেলেরী'-র মুখোশগুলি বিচিত্র। বিশেষ করে চণ্ডীর মুখোশটি। প্রসারিত ঠোঁট, লকলকে জিহ্বা ও প্রলম্বিত নাসিকা। ডান চক্ষুর উপরে চাঁদ এবং বাম চক্ষুর উপরে সূর্যের প্রতীক অঙ্কিত। ভালুক মুখোশটি না-মানব-না-পশুর আদলে চিত্রিত।

এই মুখোশ-নৃত্যও মূলত গ্রাম-দেবী চণ্ডী বা কালীর সমবেত উপাসনা যা নাকি গ্রামের কল্যাণ কামনায় আয়োজিত হয়। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তাই অভিব্যক্ত হয় দৈব শক্তির জয় এবং পাশবশক্তির পরাজয়।

সারা ভারত জুড়েই এ রকম বিচিত্রসব মুখোশ-নৃত্য এখনও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও বেশ কিছু মুখোশ-নৃত্য এখনও দৃষ্টান্ত হিসেবে বেঁচে আছে, সেখান থেকেই কয়েকটা মাত্র তুলে ধরতে পেরেছি। কারণ ক্ষুদ্র পরিসরের নিবন্ধে স্থান-সঙ্কুলান সম্ভব নয়। আসামের 'সাতরিয়া', অরুণাচল প্রদেশের 'ইয়াক নৃত্য', মেঘালয়ের 'নোংক্রেম নৃত্য' এরকম আরও অনেক মুখোশ-নৃত্য স্বমহিমায় বর্তমানেও টিকে আছে।

এযাবৎ আলোচনায় যে সমস্ত মুখোশ-নৃত্যের প্রসঙ্গ আলোচিত হল সেগুলোর মধ্যে ভারতের পূর্বাঞ্চলের তথা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষা পুরুলিয়ার ‘ছো’ অধিকমাত্রায় জনপ্রিয় যা আঞ্চলিকতার সীমা টপকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। এমনকি ছো-এর আরও দুই ঘরানা, যথা — ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেলা ঘরানাকেও অতিক্রম করে বিশ্বমঞ্চে ঠাঁই করে নিয়েছে পুরুলিয়া ঘরানা। অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্য ‘মুখা খেইল’, ‘সিঙ্গীছম’, ‘চমরীছম’ বা ‘ইয়াছম’, ‘মেপাছম’, ‘ডাইনী নাচ’, ‘রাভন নৃত্য’ ও ‘রাজধারী নৃত্য’, ‘বাকপা নৃত্য’, ‘রাভা জনজাতির নৃত্য’ প্রভৃতি নৃত্যগুলো আঞ্চলিকতার গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারেনি। এই বৈপরীত্যের কারণ হিসেবে বলতে হয় —

প্রথমত, ‘ছো’-নৃত্য পেয়েছিল রাজ্য পৃষ্ঠপোষকতা (প্রথমে ভূস্বামী বা জমিদার, তারপর রাজ্যসরকার, আরও পরে কেন্দ্রীয় সরকার)। এই পৃষ্ঠপোষণ যেমন তাকে উৎসাহ জুগিয়েছিল, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেছিল। ‘ছো’ হচ্ছে বিরাট ব্যয় সাপেক্ষ নৃত্য প্রকরণ। গ্রাম-গঞ্জ থেকে নাচের ডাক আসলে নাচতে গিয়ে যে পরিমাণ মজুরি পেতেন শিল্পীরা, তাতে আর যাইহোক সংসার চলত না তাঁদের। কারণ একটা ছো-নৃত্য অনেকগুলো পালার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, পালা বেশি হওয়ায় চরিত্রের সংখ্যাও বেশি; তারপর শিল্পীর হাতে তৈরি সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্পন্ন মুখোশ, নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য যথাযোগ্য শিল্পী, অবশেষে যাতায়াতের খরচ এসবকিছু মিলে মোটা অঙ্কের অর্থব্যয় হয়ে থাকে। এই বৃহৎ পরিমাণ খরচ দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হত না, আর একারণেই প্রয়োজন ছিল কারো না কারো পৃষ্ঠপোষকতা। প্রথম প্রথম একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-উচ্ছ্বাস-স্মৃতির প্রকাশ থেকে নৃত্যকর্মে আগ্রহী হলেও যে পরিশ্রম কৌশল ও সময় ব্যয় করতে হয় তাতে শিল্পীগণের পক্ষে অন্য পেশায় সময় দিতে পারা সম্ভব না; তাই প্রয়োজনের তাগিদেই পরবর্তীকালে পেশাদার শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কারণ শিল্পীদেরও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হয়। এই কারণে আরও বেশি অর্থোপার্জন, আরও বেশি খ্যাতি ও যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় জনমানসে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিতে সচেষ্ট হোন। ফলে আরও বেশি শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি সুচারু নৃত্যশৈলী, পালাগত বৈচিত্র্য, সূক্ষ্ম দৃষ্টিনন্দন সম্পন্ন বৈচিত্র্যময় মুখোশের প্রয়োগে কুশলী হয়ে উঠতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক গবেষকদের নজরে আসার ফলে ছো-নৃত্য প্রচারের আলোয় আসতে পেরেছিল। কারণ, রাজ্য থেকে কেন্দ্র এবং তারপর দেশের বাইরে — ক্রমান্বয়ে এই যোগসূত্র তৈরির মাধ্যম হিসেবে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রথমদিকে রাজ্য ও কেন্দ্রের ‘তথ্য ও সংস্কৃতি’ বিভাগের সুনজরে এসেছে, তারপর বিদেশ যাত্রার সুযোগ, সর্বোপরি গণমাধ্যমগুলিতে ব্যাপক প্রচারিত হতে পেরেছে।

তৃতীয়ত, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন রক্ষা করে চলেছে এই ছো-নৃত্য। পৌরাণিক পালাকে যেমন ত্যাগ করেনি, তেমনি প্রয়োজন বোধে পালাগত পরিবর্তন আনতে দ্বিধা করেননি

শিল্পীগণ। প্রথমে গণেশ-বন্দনা একই ভাবে প্রদর্শিত হয়, কিন্তু পরবর্তী পালাগুলিতে নানান পৌরাণিক পালাকে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি নিয়ে আসা হয়েছে ‘সিধু-কানহো-বীরসা’ পালা, ‘নীলবিদ্রোহ’, ‘ইংরেজদের অত্যাচারের দৃশ্য’। তবে জনপ্রিয়তার প্রশ্নে পৌরাণিক পালা এগিয়ে আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আধুনিক যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করেছে তা হল সূক্ষ্ম শিল্পগুণ সম্পন্ন, অধিক চাকচিক্য সম্পন্ন উজ্জ্বল বড়ো মুখোশের ব্যবহার; ঢোল, ধামসা, নাগড়া, সানাই, মদনভেরি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আরও কিছু অত্যাধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সংযোজন ঘটেছে, যেমন — সিঙ্গেসাইজার, কর্ণাট, ফুলোট, মাইক্রোফোন সহযোগে মাইক-এর ব্যবহার; আলোকসজ্জায় এসেছে পরিবর্তন, হেচাক বা হেরিকেনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলোর বাহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে; মঞ্চের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। খোলা আকাশের নীচেই নৃত্যানুষ্ঠান চলে, তবে বাঁশের বন্ধনীর সাহায্যে মঞ্চ ও স্ত্রীপুরুষ বসার ভিন্ন ভিন্ন দিক নির্দেশ করা হয়। বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে ময়ূরের পেখম সংকুচিত-প্রসারিত করার মতো অভিনব দৃশ্য দর্শকদের মনোহরণ করতে সাহায্য করেছে, মহিষাসুর বধের সময় দুর্গার সমস্ত শরীর জুড়ে টুনিবাল্লের বুকপুক্ বুকপুক্ দৃশ্য, শিবের ত্রিশূলে পেঁচানো টুনিবাল্ল, রঙিন বাল্লের সাহায্যে আগুন জ্বলার দৃশ্য এসবকিছুই ছো-নৃত্যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে।

চতুর্থত, মেয়েরাও এগিয়ে আসছে বীরত্বব্যঞ্জক এই কঠিন নৃত্যশৈলীকে আয়ত্ত করতে। যদিও পুরুষদের দলে এখনও পুরুষরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং মেয়েরা একক ভাবে মেয়েদের দলই তৈরি করছেন। ইদানিং পুরুষলিয়াতে ছো-নৃত্যের প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে যেখানে মেয়ে এবং ছেলে প্রত্যেকের শেখার সুযোগ রয়েছে। নদীর ধারে বালির চড়ায় চলে নাচের মহড়া। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, আমার দেখা মেয়েদের প্রথম ছো-নৃত্য ১৯৯৪ সালে সম্ভবত এপ্রিল কিংবা মে মাসে। নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল চড়িগ্রামে। প্রবাদপ্রতিম ছো-শিল্পী পদ্মশ্রী স্বর্গীয় গম্ভীর সিংমুড়ার বাসভূমি এই গ্রামে। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের মেয়েদের নিয়ে এই ছো-নৃত্য দল গড়েছিলেন। মঞ্চের চারপাশে বুম্‌বুমি হাতে নিজেও নাচছিলেন, মেয়েদের উৎসাহ দান করছিলেন এবং উপভোগ করছিলেন। কিন্তু সেই নৃত্যে বীররসের কোনও আভাস ছিল না, কারণ উল্ফা বা পাক্‌মারা এই দুই কঠিন শারীরিক কসরৎ করবার মতো শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা কোনোটিই ফ্রান্সের মেয়েদের ছিল না। পুরুষলিয়ার মেয়েরা সেই দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছেন। কারণ পুরুষলিয়ার মাটি-জল-হাওয়ায় তাঁদের কঠিন-কঠোর পরিশ্রমী করে গড়ে তোলে।

এ সবকিছুর কারণেই ছো আজ ‘জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন’ না নিলেও পাকাপোক্ত একটা জায়গা করে নিতে পেরেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রয়াত শিল্পী গম্ভীর সিংমুড়া বেঁচে থাকাকালীনই বিদেশের নানান প্রান্তে ছো-কে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্যগুলো আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। একান্ত নিজস্ব অঞ্চলেই সেগুলির ব্যাপ্তি। আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক এই নৃত্যগুলো আদিম লোকাচারের

উর্ধ্বে উঠতে পারেনি, পায়নি কোনও রাজ্য পৃষ্ঠপোষকতা। আসলে এই নৃত্যগুলিতে বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি বা সৌন্দর্যবোধ-কোনোটাই ছাপ নেই। একেবারে সরল, সাদামাটা প্রকৃতির মুখোশ তৈরিতে শিল্পীর প্রয়োজন হয় না, একান্তই নিজের নৃত্য-মুখোশ নিজেই তৈরি করেন। সময় যতই এগিয়েছে মানুষের ধী-শক্তি, রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশগুলি দৃষ্টিনন্দন যেমন নয়, তেমনি বৈচিত্র্যহীন একই আদলে তৈরি মুখোশগুলি জনমনোহরণে ব্যর্থ। সেদিক থেকে পুরুলিয়া ছো-এর মুখোশ দৃষ্টিনন্দন ও সৌন্দর্যের প্রকাশ মাধ্যম। পুরুলিয়ার মুখোশগুলোতে দেবতাকে দেবতুল্য ও দানবকে দানবতুল্য কাল্পনিকতা ছুঁয়ে যায় এবং পশুকে পশুতুল্য করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্পীরা অব্যর্থ। কল্পনা ও বাস্তবের এমন সংমিশ্রণ পুরুলিয়ার ছো-এর মুখোশ, জনমানসে অনেকবেশি দৃষ্টিনন্দিত হয়ে ধরা দিয়েছে। নৃত্য-মুখোশ নৃত্য-শিল্পীগণ নিজের হাতে তৈরি করেন বলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশগুলিতে তেমন সৌন্দর্য ও শিল্পগুণ চোখে পড়ে না। পুরুলিয়ার মুখোশে সূক্ষ্ম শিল্পীসত্তার ছোঁয়া থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পালা-পৌরাণিক ও সামাজিক উভয় ধরনের হলেও থাকে না কোনও পূর্ব প্রস্তুতি, ফলে ত্রুটিমুক্ত হতে যেমন পারেনি, তেমনি ছোট ছোট পালাগুলি কখনও কখনও মাঝপথেই থেমে যায়। পুরুলিয়ার ছো-এর পালা পূর্বপরিকল্পিত ও কঠিন অধ্যাবসায়ের ফসল। তাই পালাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে অভিনীত হয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় নূতন নূতন পালা সংযোজন, মানুষের মনে নূতন স্বাদ এনে দেয়। অন্যদিকে একই পালা, একই গান, একই মুখোশ বছরের পর বছর অভিনীত হওয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্য একঘেয়েমির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। উক্ত অঞ্চলের নৃত্যাদি বৈচিত্র্যহীনতার কারণে জনমানসকে আকর্ষণ করতে তেমনভাবে সক্ষম নয়, তাই প্রচারবিমুখ এই নৃত্যগুলো অবলুপ্তির পথে দ্রুত এগোচ্ছে। অন্যদিকে ছো-নৃত্য যত বেশি প্রচারিত হয়েছে, যশ-খ্যাতি বেড়েছে, ততই তার উপর পড়েছে পালিশ। পরিশেষে বলতে হয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ-নৃত্যগুলি আদিবাসী নৃত্যের পর্যায়েই থেকে গেছে, লোকনৃত্যের কোঠায় উঠতে পারেনি। লোকসংস্কৃতি কখনোই হারায় না, প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হয়ে চলে মাত্র। ঐতিহ্যকে যেমন আঁকড়ে থাকে, তেমনি আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে পারার ক্ষমতা রাখে। আদিবাসী সংস্কৃতি তা পারে না বলেই সে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে, কিন্তু লোকসংস্কৃতি কখনোই বিলুপ্ত হয় না। ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে একই সূতোয় বাঁধতে পেরেছে বলেই লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকনৃত্য পুরুলিয়ার ‘ছো’ আজও টিকে আছে, অন্যদিকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখোশ নৃত্যগুলো।

সহায়ক গ্রন্থ

করণ, সুধীরকুমার। ২০০৪। *লোকায়তিক*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। (সম্পা.) ২০০৭। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান। (সম্পা.) ২০০৮। লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। ২০১০। লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

চৌধুরী, দুলাল। (সম্পা.) ২০০৪। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ। কলকাতা : আকাদেমি অব ফোকলোর।

দত্ত শতপথী, ইন্দ্রানী। ২০০৮। ‘ছৌ’। কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব. সরকার।

বর্ধন, মণি। ২০০৪। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য। কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব. সরকার।

ভূঞা, ফাল্গুনি। ২০১১। বাংলার লোকসংস্কৃতি : মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণ ও প্রয়োগ। দক্ষিণ ২৪ পরগণা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন।

সরকার, প্রবীর। ২০০৮। পুরুলিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি : রাজ্য অবদান। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

সেনগুপ্ত, পল্লব। ২০১০। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

সহায়ক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০১

লেখক পরিচিতি :

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ। মহারাজা মণিচন্দ্র কলেজ

E-mail : chandicharansingmura@gmail.com